بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৭ এপ্রিল ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টারে নবনির্মিত মসজিদ বাইতুল আমানে প্রদত্ত ২৭ এপ্রিল ২০১২-এর (২৭ শাহাদত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ *رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ* رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (সূরা আল্ বাকারা:১২৮-১৩০)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, **'আর (স্মরণ কর) ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের ভিত উঠাচ্ছিল (এবং তারা দোয়া করছিল), হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে (এ সেবা) গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! (আমাদের এও নিবেদন) তুমি আমাদের উভয়কে তোমার প্রতি আত্ম সমর্পণকারী একটি উম্মতে পরিণত কর আর তুমি আমাদের ইবাদত ও কুরবানীর নিয়ম পদ্ধতি আমাদের দেখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা কবুল করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয় তুমিই পুনঃ পুনঃ তওবা গ্রহণকারী ও বার বার কৃপাকারী। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে এক মহান রসূল আবির্ভূত কর, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখাবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়'।**

এ আয়াতগুলোয় সে-ই মহান আদর্শ ও দোয়া বর্ণিত হয়েছে যার মাধ্যমে বিনয়, নম্রতা, আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা, নিজ বংশধরদের আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত রাখার চিন্তা ও দোয়া, বিশ্ববাসীর জন্য দিক-নির্দেশনা এবং দয়াময় খোদার দাসত্ব করার সচেতনতা ও এ নিমিত্তে দোয়ার পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে সেই মহান আত্মত্যাগের উল্লেখ করা হয়েছে যা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি পাথর যা কাবা গৃহের দেয়ালে গাঁথা হচ্ছিল, সেটি এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল যে, এবার এ

গৃহের (নির্মাণ কাজ) পূর্ণতা লাভের পর পিতা তাঁর পুত্রকে এবং তাঁর বংশধরকে এই জনমানব শূন্য- তৃণলতাহীন মরু প্রান্তরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রেখে যাবেন। পুত্রের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছিল, তুমি এখানে এই জনমানব শূন্য মরুভূমিতে এই গৃহের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য অবস্থান করবে। এই দু'জন মহিয়ান ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত [নবী (আ.)] আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন, একদিন এই গোটা বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবে। কিন্তু তাঁরা জানতেন না কবে এমনটি হবে। তখন কেবল ত্যাগই ত্যাগ চোখে পড়ছিল। এতদসত্ত্বেও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হল, আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়াই করছিলেন— (হে আল্লাহ্) তোমার এই গৃহের নির্মাণ কাজ যা আমরা করছি, কেবল তোমার অপার অনুগ্রহেই করছি। অতএব তুমি আমাদের এই ত্যাগকে গ্রহণ কর। কোন গর্ব নেই যে, আমরা এতবড় কাজ করেছি এর প্রতিদান স্বরূপ আমাদের কোন কিছু পাবার অধিকার আছে বা প্রতিদান পাওয়া উচিত এবং শীঘ্রই তা পেতে চাই বরং সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী প্রার্থনা গ্রহণকারীর কাছে দোয়া কবুলের আকুল আবেদন যে, আমাদের দোয়া কবুল কর। আমাদের কাছে যা কিছু ছিল আমরা সব উৎসর্গ করে দিয়েছি। আগামীর জন্যও অঙ্গীকার করছি, ত্যাগ স্বীকার করে যেতে থাকব। আমরা চাই আমাদের পরবর্তী বংশধররাও যেন এই ত্যাগের অংশীদার হয়। এটি সেই দোয়া যা ঐ দু'জন মহান নবী করে গেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে তারা বলেন, তোমার সামনে আমরা আমাদের মনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরলাম, তুমি সর্বজ্ঞানী অতএব তুমি তা জান, আমরা যা কিছু করছি এবং বলছি তা শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় করছি ও বলছি। আমাদের এ ত্যাগ স্বীকার করে তুমি অচিরেই একে এমন ঘরে পরিণত কর যা তোমার ঘর হবে, আর তোমার ঘর হবার কল্যাণে এই জনমানব শূন্য স্থানটি যেন জনবহুল স্থানে পরিণত হয়। আমরা তোমার আদেশ যতটা বুঝেছি তার আক্ষরিক বাস্তবায়নস্বরূপ এ ঘর নির্মিত হয়েছে, যেন এ ঘর মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়; কিন্তু হে খোদা! এটি প্রকৃত অর্থে আবাদ হওয়া মুলতঃ তোমার অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বাহ্যিকভাবে যারা এ ঘরটি আবদ করবে তাদেরকেও তুমি অন্তঃদৃষ্টি এবং দূরদর্শিতা দান কর যা তাদেরকে তোমার সন্ধান দিবে এবং আধ্যাত্মিকতায় অগ্রগামী করবে। এই ছিল সেই ধর্মীয় প্রেরণা যার অনুসরণে মুসলমানদের মসজিদ নির্মিত হয় এবং হওয়া উচিত। নতুবা সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ কোনই মূল্য রাখে না। যদি খুব সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয় কিন্তু তা ধর্মীয় প্রেরণা শূন্য থাকে তাহলে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে দেখা যায় না। অন্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে তাদের ইবাদতের স্থানগুলোতে কারুকার্য করে থাকে মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মসজিদ যেন সেভাবে কারুকার্য খঁচিত না হয়। কিন্তু কারুকার্য খঁচিত অনেক মসজিদও আমাদের চোখে পড়ে যা রাজা বাদশাহ্ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বানিয়েছে। বরং কোন কোন মসজিদের উপর রাজা বাদশাহ্‌রা সোনার গিলটি করিয়েছে। কিন্তু এগুলো অর্থাৎ সোনার কাজ করানো ও কারুকার্য মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য নয়। মসজিদের সৌন্দর্য এর নামাযীদের উপর নির্ভর করে। এমন নামাযী যারা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানী।

একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উল্লেখ করেছেন, আমি একটি আরব দেশে গেলাম (খুব সম্ভব মিশরের ঘটনা)। সেখানে আমি অনেক বড় ও খুব সুন্দর একটি মসজিদে গিয়ে দেখলাম, চার পাঁচজন নামাযী মসজিদের এক কোনায় নামায পড়ছে। আমি যখন তাদের জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কি? তখন সেই মসজিদের ইমাম যিনি তাদের নামায পড়াচ্ছিলেন বললেন, মানুষ এখানে নামায পড়তে আসে না এবং কোন নতুন মানুষ হয়ত দেখে

বলবে, এত বড় ও এত সুন্দর মসজিদ কিন্তু নামাযী মাত্র চার পাঁচজন- এ লজ্জায় মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়াই না বরং এক কোনায় নামায পড়ি, মানুষ যেন মনে করে আসল জামাত শেষ এবং যারা পরে এসেছে তারা এখন নামায পড়ছে।

অন্য চিত্রও আছে আর তা হল, মসজিদে মানুষ যায় এবং সমাগমও যথেষ্ট হয় কিন্তু তাদের হৃদয় সেই ধর্মীয় প্রেরণা শূন্য থাকে যা একজন মসজিদগামী মানুষের মাঝে থাকা উচিত। নামায চলাকালেও জাগাতিকতা ছেয়ে থাকে। সম্পূর্ণ মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ থাকে না। কাজেই আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, যখনই আমরা মসজিদ নির্মাণ করি বা করব তখন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অবনত হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যেন নির্মাণ করি। মসজিদ নির্মাণের জন্য আমরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছি এর জন্য কোন ধরনের গর্ব না করে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কেননা আমরা যে কুরবানী করি তা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর লক্ষভাগের একভাগও নয় বরং এরচেয়েও অনেক কম। আমরা শুধু আর্থিক কুরবানী করি, তাও আবার নিজেদের সাধ্য-সামর্থ অনুযায়ী। বর্তমান সময় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করাও অনেক বড় একটি কুরবানী, পুণ্য লাভের আশায় ত্যাগ স্বীকার হয়, নিজের চাহিদা উপেক্ষা করে আর্থিক কুরবানী করা হয়। এছাড়াও মসজিদ নির্মাণ করা একটি প্রশংসনীয় কাজ। মহানবী (সা.) অনেক স্থানে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পুরস্কৃত হয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে পশ্চিমা দেশগুলোতো এদিকে জামাতের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে এবং মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। কিছু মানুষ তাদের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে এতোটা উপেক্ষা করেছে যে, অতিরিক্ত সম্পদ থেকে নয় বরং নিজেদেরকে কষ্টে নিপতিত করে ত্যাগ স্বীকার করছে। তথাপি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যেন কখনোই কোন ধরনের অহংকার না করি।

এই মসজিদ নির্মাণে প্রায় বারো লক্ষ পাউন্ড খরচ হয়েছে অর্থাৎ ১.২ মিলিয়ন পাউন্ড এবং এখানকার জামাত প্রায় এ পরিমান অর্থ দেয়ার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আদায়ও হচ্ছে। শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ইতোমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। অনেকে বেশ বড় অঙ্কের কুরবানীও দিয়েছেন। আমি দেখছিলাম, একেকজন চুরাশি হাজার পাউন্ড অথবা আটাত্তর হাজার পাউন্ড পর্যন্ত দিয়েছেন। আর এমন সদস্যও আছেন যারা পনের-বিশ হাজার বরং ত্রিশ হাজার পাউন্ড দিয়েছেন। আমি প্রায় এগারজনের সার্বিক ওয়াদার পরিমান দেখছিলাম যা মোট তিন লক্ষের উপরে দাঁড়ায়। কাজেই এটি অনেক বড় আর্থিক কুরবানী যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে জামাতের সদস্যরা করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেক ত্যাগ স্বীকার যেন বিনয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগী করে, কেননা এ সবকিছু সত্ত্বেও যে আদর্শ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা হল, আমাদের ত্যাগ অতি নগণ্য এর কোন মুল্য নেই। দ্বিতীয়তঃ এসব কুরবানী তখনই ফলপ্রদ হবে যখন এই ঘর আবাদ হবে। সেই তৃণলতাহীন মরুপ্রান্তর যেখানে জনমানব ছিল না আর সেখানে আল্লাহ্ তা'লার ঘর বানানো হল। এই দেশসমূহও এ অর্থে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিরান। এ এলাকাগুলোকেও আবাদ করতে হবে এবং সবুজ-শ্যামল বানাতে হবে আর এ উদ্দেশ্যে নিয়েই আমরা ইউরোপে মসজিদ নির্মাণ করছি। অতএব এটি অনেক বড় কাজ যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। শুধুমাত্র জুমুআর নামায পড়েই আমাদের মসজিদ আবাদ হতে পারে না বরং অন্যান্য নামাযেও উপস্থিতি আবশ্যক। আজ এই মসজিদ উদ্বোধনের দিনে এ দোয়াও করুন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অতএব আমাদের আর্থিক কুরবানী তখনই গ্রহণযোগ্যতা পাবে যখন আমরা খোদা তা'লার সাথে এ অঙ্গীকারও করব এবং এ দোয়াও করব যে, "(হে খোদা) ঐ কুরবানী সমূহকে কবুল করে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও বিধান কর এবং আমাদেরকে এ মসজিদ আবাদ রাখারও সামর্থ দাও। কেননা তুমি জানো, কেবল তোমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই এ মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর এ এলাকায় এমন লোকদের বসতি গড়ে তোল যারা আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হবে। কেননা তোমার স্মরণকে সমৃদ্ধ করার মানসে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। অতএব আমাদের কুরবানীসমূহ গ্রহণ করে আমাদেরকে সেই আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করো যা তোমার নৈকট্যের কারণ হবে। যেন আমরা তোমার কল্যাণরাজি অর্জন করে তোমার জান্নাতসমূহের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম হই।

হাদীসে এসেছে, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের একটি হাদীস, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, **'কিয়ামতের দিন মহা প্রতাপশালী খোদা বলবেন, উপস্থিত সবাই অচিরেই জানতে পারবে যে, কে মর্যাদাবান ও সম্মানিত। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! মর্যাদাবান এবং সম্মানিত কে? তিনি (সা.) বললেন, মসজিদ সমূহে যারা খোদার স্মরণে একত্রিত হয়'**। এছাড়া বুখারীতে একটি হাদীস রয়েছে যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যায় আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতে আতিথেয়তার উপকরণ সৃষ্টি করেন'**।

অতএব আমাদের মসজিদসমূহ মর্যাদা ও সম্মানের উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারী হওয়া উচিত। এ মসজিদ এবং এখানে আগমনকারীরা আল্লাহ্ তা'লার পছন্দনীয় লোক হবে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবে এবং জান্নাতে তাঁর আতিথেয়তা থেকে অংশ লাভকারী হবে—আমি সে দোয়াই করি। তাই কতইনা সৌভাগ্যবান ঐসব মানুষ যারা উক্ত উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আর উক্ত নিয়্যতে মসজিদসমূহে আগমন করে আর কেবল এ জগতের জান্নাতই নয় বরং সে জগতের জান্নাতও লাভ করে যা ভিন্ন এক জগত। অথবা এভাবেও বলা যায়, কেবল ঐ জগতের জান্নাত অন্বেষণ করে না যার উল্লেখ হাদীসে রয়েছে। বরং এ দুনিয়ার জান্নাতও তারা অন্বেষণ করে।

আমাদের অধিকাংশ মসজিদে গম্বজের নিচে লিখা থাকে আর এখানেও (বাইতুল ফুতুহ্-তেও) এই বৃত্তাকারে লিখা আছে, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (সূরা আর্ রা'দ:২৯) অর্থাৎ জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র যিক্‌রের মাধ্যমেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। অতএব যাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে তাদের জন্য এর চেয়ে বড় জান্নাত আর কি হতে পারে? বর্তমান বিশ্বে যে ধরনের অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এর প্রধান কারণ হল, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া। খোদা তা'লাকে স্মরণকারী, যারা তাঁর স্মরণে রত থাকে তারা বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টও খোদা তা'লার খাতিরে সহ্য করেন এবং এগুলোকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসেবে নেয় এবং আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেন। দুনিয়াতে শত শত মানুষ আত্মহত্যা করে, প্রায় প্রতিদিনই করছে কারণ, তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে না বা কারো কারো উপর পার্থিব দুঃখ-কষ্টের এমন প্রভাব পড়ে যে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পূর্বেই আমাকে পাকিস্তান হতে কেউ একজন লিখেছেন, সেখানে শেখুপুরা এলাকার এবং সম্ভবতঃ আশে পাশের এলাকায় প্রচন্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে, মানুষের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এক কৃষক সম্ভবতঃ বাঙ্গী ক্ষেতে গিয়ে দেখে তার সব শেষ হয়ে গেছে। এতে সে এত মর্মাহত হয় যে, দেখা মাত্রই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে সেখানেই মারা যায়। মোটকথা এগুলো

পার্থিব আঘাত বা দুঃখ-কষ্ট। খোদা প্রেমিকদের এসব ক্ষয়-ক্ষতিতে ততটা (সদমা) দুঃখ হয় না কেননা তারা প্রত্যেক দু:খকষ্টের ঘটনায় আল্লাহ্ তা'লার সাথে ভালবাসার সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করে।

মু'মিন দুঃখে-কষ্টে সর্বদাই খোদা তা'লার ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়ে হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ করে। পবিত্র কুরআনে সূরা রহমানের একস্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (সূরা আর্ রহমান: ৪৭) অর্থাৎ যে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত মহিমার কথা ভেবে ভীত থাকে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভয় রেখে যারা তার যিক্র, ইবাদত করে তারা আন্তরিক প্রশান্তি পেয়ে এ ইহকালেও জান্নাত লাভ করে। আর রহমান খোদার দাস হবার সুবাদে এক বান্দা এ জগতে যে জান্নাত লাভ করে তা আবার তাকে পরকালের জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়। পরবর্তী আয়াত যা আমি পাঠ করেছি তাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) এই দোয়া করছেন, رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের দু'জনকে পুণ্যবান দাস বানিয়ে দাও। এখানে এটিও লক্ষ্য করুন, পুনরায় পরম বিনয়ের প্রকাশ হচ্ছে। সব ধরনের ত্যাগ-তিতিক্ষা করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত রসূল হওয়া সত্ত্বেও এই দোয়া করছেন, হে খোদা! তুমি আমাদেরকে পুণ্যবান বান্দা বানাও। খোদার নির্দেশ পালনকল্পে নিজের স্ত্রী এবং পুত্রকে জনমানবশূন্য ধু ধু মরুভূমিতে ছেড়ে আসা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ.) নিবেদন করছেন, তুমি আমাকে আনুগত বানিয়ে দাও। সব কিছু তিনি আল্লাহ্ তা'লার জন্য ত্যাগ করেছেন। সন্তান উৎসর্গ করলেন, স্ত্রী দিয়ে দিয়েছেন এরপরও তিনি দোয়া করছেন, এমনভাবে সমর্পণের শক্তি দাও যেন আমি পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হয়ে যাই। আল্লাহ্র খাতিরে গলায় ছুরি চালাতে ছেলের প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এই দোয়া করেছেন, আমাদেরকে প্রত্যেক নির্দেশ পালনকারী, অনুগত এবং নেক বান্দা বানাও।

অতএব একজন মু'মিনকে এই মর্যাদা লাভের চেষ্টাই করা উচিত। কখনো নিজের পুণ্যের বিষয়ে দম্ভ করা উচিত নয় আর এই পুণ্যের উপর ভরসা করাও উচিত নয়। কখনো নিজের কুরবানীর অহংকার থাকা উচিত নয়। খোদা তা'লার সমীপে ভীত-ত্রস্ত হৃদয়ে সর্বদা এ নিবেদনই হওয়া উচিত, হে আল্লাহ! আমাদের কর্ম একেবারেই মূল্যহীন, তোমার কৃপা হলেই আমরা তোমার পুণ্যবান বান্দা হতে পারি, রহমান খোদার নিষ্ঠাবান বান্দা হতে পারি। অতএব আমাদের প্রার্থনা হল, আমাদের দোয়া হল, আমাদের সকাতর নিবেদন হল, আমাদেরকে পুণ্যকর্মে প্রতিষ্ঠিত রেখো এবং তোমার সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার সামর্থ দিও। তোমার সন্তুষ্টির পথে চলার শক্তি দিও; এটিই সেই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর শুধু নিজের জন্যই নয় বরং আমরা আমাদের বংশধরদের জন্যও দোয়া করি। আর দোয়াটি হল, وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে আনুগত্যকারী এবং তোমার আদেশ পালনকারী উম্মত বা বংশধর সৃষ্টি কর।

অতএব আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করে এটিকে আবাদ করার চিন্তা নিজের জীবন পর্যন্তই নয় বরং এও আবেদন করলেন হে আল্লাহ্! এটিকে আবাদ করার জন্য, এ থেকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের জন্য এবং তোমার পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি করতে থেকো। একজন মু'মিনকেও এ দোয়াই করা উচিত।

কাজেই আমাদের জন্য আজকে এটিই শিক্ষণীয় বিষয়। মসজিদের সাথে শুধু যেন বৃদ্ধ ও বয়স্ক লোকদের অথবা অবসরপ্রাপ্ত মানুষের সম্পর্ক না হয় বরং (কর্মজিবীরাও) ব্যস্ততার মধ্য থেকে সময় বের করে এখানে

আসবেন এবং একে আবাদ করবেন। আমরা যেন আমাদের বংশধরদেরকে এর সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করি। আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে যুবক ও কিশোর-কিশোরীদের মাঝেও যেন ইবাদতের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এর জন্য যেখানে বাস্তবমুখী প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে সেখানে এ কাজের জন্য দোয়াও এক বড় মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা যিনি হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং সর্বশ্রোতা, আন্তরিকতার সাথে দোয়া করলে তিনি তা গ্রহণ করে থাকেন। ইবাদতের এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালনের যে স্পৃহা ও উদ্দীপনা তা যেন বংশপরম্পরায় সৃষ্টি হতে থাকে এর জন্য দোয়া করুন। ইবাদত ও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালনে যদি নিজেই অলস হয়ে থাকেন তবে বংশধরদের মধ্যেও আলস্য থেকে যায়। অতএব প্রতিটি মসজিদ নির্মাণের সাথে যেখানে নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ও দোয়া করার প্রয়োজন সেখানে সন্তানের তরবীয়তের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দোয়া, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا তরবীয়ত ও ইবাদতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নিজ সন্তানদের ভালো অবস্থানের দিকে নিয়ে যাবার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। مَنَاسِكَنَا'র অর্থ হল ইবাদত। সেসব বিষয় ও আল্লাহ্‌র প্রাপ্যসমূহ আমাদেরকে প্রদান করতে হবে। অতএব এ শব্দটি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সব কিছু পালন করার পরও যেন কেউ এমন না করে বসে যে, সে বহু কিছু করে ফেলেছে। এরপর দোয়া হল, وَتُبْ عَلَيْنَا অর্থাৎ আমাদের তওবা গ্রহণ কর আর আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দাও। আমরা যে ছোটো-খাটো ভুল-ত্রুটি করেছি তা ক্ষমা করার মাধ্যমে আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তওবা গ্রহণকারী এবং বারবার দয়াকারী।

অতএব নিরবচ্ছিন্নভাবে এ দোয়া করা হলে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যও পূর্ণতা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টার প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হবে। নিজ সন্তানদের এ পথে পরিচালিত করার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। এরফলে আমরা সে সব কল্যাণ ও আশিসের অংশীদার হবো যা হযরত ইবরহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দোয়া গৃহীত হবার কারণে এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লা জারী করেছেন। আর এ কল্যাণ গোটা পৃথিবীকে নিজের আওতাভূক্ত করে এমন বিপ্লব ঘটিয়েছে যে, মৃতরা জীবন ফিরে পেতে লাগল। আধ্যাত্মিকতার নতুন নতুন ঝর্ণা উৎসারিত হল এবং ইবাদতের সে মান প্রতিষ্ঠিত হল যা না তো পূর্বে কেউ দেখেছে আর না-ই শুনেছে। (এ দোয়া গৃহীত হবার ফলে) সেই মহান রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হয়েছেন যিনি ইবাদতের পরম আসনে সমাসীন হয়েছেন। যাঁর উপর বিশ্বস্ততাও পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি সবোর্চ্চ মার্গে পৌঁছেছেন। আল্লাহ্ তা'লার নিকট তাঁর এসব বিষয় গৃহীত হবার পর এগুলো সে পর্যায়ে পৌঁছে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রসূল খাতামুল আম্বিয়া দ্বারা এ ঘোষণা করান, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আল্ আন'আম:১৬৩) অর্থাৎ তুমি ঘোষণা করে দাও, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ্‌র জন্য। এখানে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে ইবাদত, কুরবানী এবং সব কাজের সেই মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি, শোনাও যায়নি। এটি সেই মে'রাজ বা চূড়া ছিল যা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীর জন্য ঘোষণা করিয়েছেন, এই রসূলের আনুগত্যেই এখন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করা যাবে, এটি ব্যতীত সম্ভব নয়। এটি সেই উত্তম আদর্শ যা ইবাদত ও ত্যাগের সুমহান মান প্রতিষ্ঠিত করেছে। যারা তাঁর

(সা.) পবিত্রকরণ শক্তি থেকে সরাসরি কল্যাণ মন্ডিত হয়েছেন, তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শ অবলম্বন করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভের নতুন নিত্য নতুন পথ উম্মোচিত হয়েছে। সারা রাত জেগে ইবাদতকারী এবং দিনের বেলা ধর্মের জন্য কুরবানীকারী সৃষ্টি হয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাবে মৃতরা নব জীবন লাভ করেছে। ইনি সেই মহান রসূল যিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব জাতি এবং সব যুগের জন্য এসেছিলেন। এ কল্যাণধারা আজও বহমান রয়েছে। এ উত্তম আদর্শ আজও সেভাবে উজ্জল ও প্রদীপ্ত যেমন প্রথম দিন ছিল। যে মহান শিক্ষা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যা তিনি (সা.) নিয়ে এসেছেন, তা আজও স্বমহিমায় ভাস্বর। এই মহান নবীকে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে সেই নিষ্ঠাবান দাস দান করেছেন, যাকে পরবর্তীদের মধ্যে প্রেরণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাজ প্রবহমান রেখেছেন, যার মধ্যে আয়াত পাঠ করে শুনানো, আত্মার সংশোধন এবং কিতাব শিক্ষা দেয়াও রয়েছে এবং শিক্ষার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা রয়েছে। এই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের অনুসারীরাও তাদের মনিব ও অনুসৃত মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুযায়ী স্বীয় ইবাদত ও আমলকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করে এবং ইসলামী শিক্ষা সমূহকে তারা এমনভাবে শিরোধার্য করেছে যে আহমদী বিরোধীরাও বলতে বাধ্য হয়েছে, ইসলামী রীতি-নীতির বাস্তব চিত্র দেখতে হলে এসব লোকদের মধ্যে দেখো।

অতএব এ হচ্ছে সেই মান যা আমাদের জ্যেষ্ঠরা প্রতিষ্ঠিত করে বিরোধীদের মুখ শুধু বন্ধই করেন নি বরং তাদেরকে এটি স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন, খাঁটি ইসলামের বাস্তব চিত্র আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের মধ্যে দেখ। আজও আমাদের জন্য এটিই অনেক বড় উদ্দেশ্য যা আমাদেরকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, যাকে সামনে রেখে আমাদেরকে জগদ্বাসীর মুখ বন্ধ করাতে হবে। নিজেদের সৎকর্মের মাধ্যমে বিশ্বকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। ইবাদত ও নামাযের মাধ্যমে সিজদাস্থল সিক্ত করে আল্লাহ্ তা'লার করুণা আকৃষ্ট করতে হবে। নিজেদের পাশাপাশি নিজেদের সন্তানদেরও এ লক্ষ্য অর্জনের মানসে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। তবেই আমরা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব। তখনই আমরা رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-এর দোয়া থেকে কল্যাণ অর্জন করতে পারব। তখনই আমরা যুগ ইমামের হাতে বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালনকারী গণ্য হব। তখনই আমরা খোদার প্রিয় মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য করে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের দুনিয়া ও পরকাল সুন্দর করতে পারব।

অতএব আজ এ মসজিদ নির্মাণের সাথে যারা দুর্বল প্রকৃতির লোক রয়েছেন তারা নিজেদের নতুন পথ নির্ধারণ করুন। যা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করার পথ, যা মহানবী (সা.)-কে ভালবাসার দাবী সত্য প্রমাণের পথ। যা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা আকৃষ্ট করার পথ। অনুরূপভাবে যারা ভাল মানের, যারা নামাযের প্রতি মনোযোগী, যারা নিয়মিত মসজিদে আসেন, মসজিদ আবাদ করার ব্যাপারে যত্নবান তারাও সর্বোচ্চ মানে অধিষ্ঠিত হবার জন্য ইবাদত ও আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানে উপনীত হবার চেষ্টা করুন। এখন এই মসজিদ এখানকার জামাতের জন্য একটি বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যম হওয়া উচিত। আমি যে তথ্য নিয়েছি- তদানুসারে বড় হলে সাতশ' ষাট জন পুরুষের নামাযের সংকুলান হবে, এঁকে প্রত্যেক নামাযে পূর্ণ করার জন্য অচিরেই ব্যবস্থা নিন। একইভাবে আমাকে এ রিপোর্টও দেয়া হয়েছে, মহিলাদের জন্য পাঁচশ' ষাট জন নামাযীর জায়গা রয়েছে। প্রয়োজনের সময় দুই হলে ছয়শ' আশি জনের নামাযের সংকুলান হতে পারে। অর্থাৎ সর্বমোট এ মসজিদে প্রায় দু'হাজার নামাযীর সংকুলান হবে বা পড়তে পারবেন। এই "পড়তে পারবেন" বাক্যটিকে অতি দ্রুত

"পড়ছেন"তে পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। আর তখনই মসজিদের প্রতি করণীয় ও ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুক্তরাজ্য জামাতসহ পুরো ইউরোপে মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে কিন্তু এই নির্মাণের সৌন্দর্য নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত। এই মসজিদসমূহের সৌন্দর্য নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত। আমি হিসাব করছিলাম, দেখছিলাম; ২০০৩ সালে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ এর উদ্বোধন হয়। এর পূর্বে শুধুমাত্র যথারীতি মসজিদ কেবল একটিই ছিল (অর্থাৎ মসজিদে ফযল)। এরপর ১৪টি নতুন পরিকল্পিত মসজিদ যুক্তরাজ্য জামাতকে আল্লাহ্ তা'লা বানানোর তৌফিক দান করেছেন। এভাবে ইউরোপে বিগত সাত আট বছর পূর্বেও যেখানে কেবল ১৩টি মসজিদ ছিল সেখানে বর্তমানে প্রায় ৫৭টি মসজিদ রয়েছে। প্রায় এজন্য বলছি কারণ একটির নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গত সাত আট বছরে ৪৪টি নতুন মসজিদের সংযোজন হয়েছে। এর মাঝে সবচে' বেশি হয়েছে জার্মানীতে। কিন্তু এঁর সৌন্দর্য এর নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য আমি আজ আবার এই ইউরোপীয় দেশসমূহে বসবাসকারী আহমদীদেরকে বলছি, আমাদের গর্ব মসজিদ নির্মাণে নিহিত নয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.)-ই করে গেছেন, এক সময় মসজিদ নির্মাণ করে অহংকার করা হবে। কিন্তু এই অহংকার মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের জামাতের সাথে সম্পৃক্তদের কাজ নয়। অন্য মুসলমানরা এ বিষয়ে বড়াই করতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্যে তখন পূর্ণ হবে যখন আমাদের প্রতিটি মসজিদ মুসল্লীর সংখ্যাধিক্যের কারণে ছোট হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

আমি এখন সেই নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকের কাছ থেকে যাঁরা সরাসরি কল্যাণ লাভ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের ইবাদতের প্রতি একাগ্রতা এবং তাঁরা যে মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে চাচ্ছি- যা আমি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী থেকে নিয়েছি। নামাযে তাঁদের নিমগ্নতার বর্ণনা শুনুন।

ডেস্কা নিবাসী গাফ্ফার সাহেবের পুত্র হযরত জান মোহাম্মদ সাহেব (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে মাগরীবের নামায (কাদিয়ানের) মসজিদ মুবারকের ছাদে পড়ার সময় মসজিদ মুবারকের মেহরাবের পশ্চিম দিকের আঙ্গিনায় মির্যা নিযাম উদ্দিন সাহেব ও অন্য আট নয়জন আসর বসিয়েছিল, আর তারা হুক্কা পান করছিল। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘোর বিরোধী আত্মীয় ছিল আর বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ধর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন বরং খোদা তা'লাকেই মানতো না। তিনি বলছেন, তারা আসর বসিয়েছিল, হুক্কা পান করছিল, আর চাটাইয়ের উপর মদের বোতল পড়ে ছিল। মত্ত লোকেরা খাটের উপর বসা ছিল। যখন আমরা নামায পড়তে শুরু করলাম। প্রথম তকবীরের সাথে সাথেই তারা শারদ ও তবলা বাজাতে শুরু করলো। আর গায়করা গাইতে শুরু করলো যাতে মসজিদের নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি বলছেন, আমাদের নামাযে অসাধারণ মনোযোগ ছিল। যা হচ্ছিল তা আমাদের মনোসংযোগে আদৌ চিড় ধরাতে পারে নি।

হযরত হাকীম আলী সাহেব (রা.) বয়আতের পর স্বীয় পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তাঁর (আ.)-এর ভালবাসা আমাকে এমন উম্মাদ প্রায় করে দিল, (বয়আতের পর) এমন কোন মাস ছিল না যে মাসে আমি (কাদিয়ান) উপস্থিত হতাম না। আমার জীবন যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শনের জন্য নিবেদিত ছিল। আমি আমার বাড়ীর পাশে পৃথক ছোট্ট একটি মসজিদ বানিয়ে নিলাম। আমি তাহাজ্জুদ নামাযের সময় ঐ মসজিদে চলে যেতাম এবং এশার নামায পড়ে মসজিদ থেকে ফেরত আসতাম। বিশ বা বাইশ ঘন্টার মত দীর্ঘ

সময় মসজিদে থাকতাম এবং রোযা রাখতাম। আর একবেলা খাবার খেতাম কিন্তু কোন প্রকার ক্ষুধা-পিপাসা লাগতো না। আমি এ সময় টুকুতে পবিত্র কুরআন পাঠ, নামায ও দোয়ায় অতিবাহিত করতাম এবং অত্যন্ত আনন্দিত থাকতাম। আর অবস্থা এরূপ হয়ে গেল, কোন বিষয়ে দোয়া ও মনোযোগ নিবদ্ধ করলে তখনই কাশ্‌ফ এর মাধ্যমে সঠিক সংবাদ পেয়ে যেতাম। এ কারণে খোদা তা'লা, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমার ভালবাসা আরো বেড়ে যায়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আমার ঈমান এমন দৃঢ় হল যা কোন ভাবে দোদুল্যমান হওয়া সম্ভব ছিল না।

এখানেও অনেকে এসেছেন যারা এসাইলেম করেছেন, অনেক বয়স্করা আছেন, অনেকেই অবসরে আছেন, সময় নষ্ট করার পরিবর্তে তাদেরকে ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। এটি হল আমাদের ইবাদতের মানদন্ড যা আমাদের জন্য আদর্শ।

অতঃপর পুনরায় হযরত মীর মেহেদী হোসেন সাহেব (রা.) বলেন, মসজিদে মুবারকের ভেতরে প্রথম দিকে তিনটি প্রকোষ্ঠ ছিল। অর্থাৎ ছোট্ট তিনটি স্তম্ভ বিশিষ্ট ছোট মসজিদ ছিল। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দু'টি করে সারি দাঁড়াতে পারত। সামনে আর পিছনে আর এক সারিতে ছয়জন করে দাঁড়াতে পারত। মসজিদের বাহিরে ডান পাশে একটি ছোট আঙ্গিনা ছিল যা এখন হযরত উম্মুল মু'মিনীনের থাকার ঘর। সেখানে মালিক গোলাম হোসেন সাহেব রুটি প্রস্তুতকারক এবং মরহুম মোহাম্মদ আকবর খাঁন সানওয়ারী সাহেব যথাক্রমে রুটি ও তরকারি নিয়ে বসে ছিলেন। আমাকে মালিক সাহেব প্রথমে একটি ছোট প্লেটে ভাত দিলেন, রুটি দিলেন। তিনি বলেন, আমি প্লেট থেকে দু'তিন লোকমা খেতেই হযরত মৌলভী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব তকবির দিয়ে নামায আরম্ভ করে দিলেন। আমি দ্রুত খাবার রেখে দিলাম। মসজিদে প্রবেশ করব এমন সময় রুটি প্রস্তুতকারক কিছুটা কঠোর ভাষায় বললেন, (তিনি রুটি দিচ্ছিলেন) মিয়াঁ! আগে রুটি খেয়ে নিন, নামায পরে পড়তে পারবেন। পাঞ্জাবী ভাষায় বললেন, না হয় ক্ষুধায় মরতে হবে, আর এও বললেন, আগামীকাল দুপুরের পূর্বে খাবার পাবেন না। আমি বললাম, এখানে রুটি খাবার জন্য আসি নি। নামায-ই তো আসল। এটি ছাড়তে পারব না। এই বলে এশার নামাযে যোগ দিলাম।

হাকীম ফজলুর রহমান সাহেব তাঁর পিতা হাফিয নবী বখ্‌শ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তাঁর ভেতর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল এবং প্রকৃতিগতভাবে এরূপ সাবধান ছিলেন যে, কেউ তাকে হুযুর (আ.)-এর জীবন চরিত বর্ণনা করতে বললে তিনি সর্বদা এ উত্তরই দিতেন, আমার স্মরণ শক্তির ব্যাপারে আমার নিজেরই বিশ্বাস নেই। পাছে হুযুরের প্রতি কোন ভুল বিষয় আরোপ করে না বসি। তিনি শেচ ও পানি বিভাগের পাটওয়ারী ছিলেন এবং ভূমি জরিপের সময় প্রায় সারা দিন তাঁকে মাঠে-ঘাটে ঘুরতে হতো এমন কি জৈষ্ঠ্য মাসেও যা পাঞ্জাবে প্রচন্ড দাবদাহের মাস। এতে মানুষ যে কত ক্লান্ত হয় তা জানা কথা। কিন্তু তিনি রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য অবশ্যই উঠতেন। আর আমাদেরকেও খুব তাগাদা দিতেন (অর্থাৎ তাঁর নিজের সন্তানদেরকেও খুব তাগাদা দিতেন)। রমযান মাসে দিনে প্রচন্ড গরম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন। শীতের দিনে সাধারণত তাহাজ্জুদের নামায শ্রুতশব্দে পড়ে তাতে সন্তানদেরও অন্তর্ভূক্ত করতেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি কুরআনের হাফিয ছিলেন। আমাদেরকে নামাযের জন্য অনেক তাকীদ করতেন আর আলসেমি দেখালে খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। স্বয়ং আমাদের কুরআন পড়িয়েছেন। দিনের বেলায় নিজের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে সময়

না পেলে রাতে পড়াতেন। পিতা-মাতার জন্য এটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। আমরা যদি সন্তানদের তরবীয়তের এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি আর পিতা-মাতার ইবাদত যদি এমন হয় তাহলে সন্তানরা শিখবে। এসব দেশে যেখানে মানুষ ধর্ম থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে আর আমাদের কোন কোন পরিবারের সন্তানরা প্রভাবিত হচ্ছে তাই এসব দেশে অনেক সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ধর্মের উপর কেবল প্রতিষ্ঠিত থাকাই নয় বরং নিজেদের মানকে উন্নতও করা আবশ্যক। অধিকন্তু সন্তানদেরও নিগরানী করতে হবে এছাড়া তাদের সুশিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। আমি চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছরের লোকদেরকেও দেখেছি যারা নিজেরা মধ্যরাত পর্যন্ত টিভি দেখতে থাকে, অথবা ইন্টারনেট দেখতে থাকে, কতকের স্ত্রী'র পক্ষ থেকেও অভিযোগ এসে থাকে, যদি অবস্থা এমনটি হয় তাহলে সন্তানদের কি তরবীয়ত করবেন?

অতএব বিশেষভাবে এসব দেশে বসবাসকারী আহমদী এবং মোটের উপর সমগ্র পৃথিবীতে বসবাসকারী আহমদীদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জ। কেননা বর্তমানে শয়তান স্বীয় কার্যকলাপে সীমা লঙ্ঘন করেছে, আমাদেরকে এর মোকাবিলা করতে হবে আর এটি আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। আর ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়া সম্ভব। তাই এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিন।

অতঃপর শেখ নূরউদ্দিন সাহেব নিজের বয়াতোত্তর অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, কিছুকাল পর অমৃতসরে চলে আসি, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে উদাসীনতা দেখা দেয় আর ধর্মীয় অবস্থা ভাল ছিল না। গ্রীস্মের এক দুপুরে আমি শুয়ে ছিলাম, এমন মনে হচ্ছিল যেন অন্তিম মুহূর্ত। তিনি নিজেকে নিজে স্বপ্নে দেখছেন, শোয়া অবস্থায় (জীবনের) শেষ মুহূর্ত। আমি মানুষের কথা-বার্তা শুনছিলাম কিন্তু জবাব দিতে পারছিলাম না। আমি সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখলাম, মনে হয় সম্ভবতঃ এটি দিব্য দর্শনের অবস্থা ছিল। আমাকে গোসল করানোর পর কাফন পরানো হয় এরপর দাফন করা হয়, (আমার কবরে) মাটি ঢালা হয়। দাফনের পর মানুষ যখন ফিরে যায় তখন উভয় দিক দিয়ে কবর আমাকে এমন ভাবে যাঁতা দেয় যে, আমি তা সহ্য করতে পারি নি। এরই মধ্যে আমি দেখি, ঠিক সম্মুখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাঁড়িয়ে আছেন, আমার দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলেন, আপনি আমাদের সাথে এ অঙ্গীকার করেছিলেন? এক দিকে কষ্ট অন্য দিকে হযরত সাহেবের কথা! আমি অনেক কাঁদি আর নিবেদন করি। হুযূর আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি তওবা করছি ভবিষ্যতে আর দুর্বলতা দেখাব না, হযরত সাহেব চলে গেলেন। তিনি বলেন, আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, ঐ অবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তন হল ঠিকই তবে এমন ভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত আর কষ্টে ছিলাম যা বর্ণনাতীত। অশ্রু ঝরছিল আর অত্যন্ত ত্রস্ত ছিলাম। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে নামায আরম্ভ করি। এক সময় পর্যন্ত আমার উপর এ ঘটনার প্রভাব বিদ্যমান ছিল, মানসিক কষ্টও ছিল আর শারীরিক ব্যথাও ছিল।

কাজেই এ ভুল-ভ্রান্তি যা ঐ যুগের পুণ্যবাণ মানুষের দ্বারা সংঘটিত হত, আল্লাহ্ তা'লা যাদের প্রতি করুণা করতে চান তাদেরকে এর মাধ্যমেও সর্তক করেন। তাই এটিও আল্লাহ্ তা'লার স্নেহের একটি ব্যবহার যে, তিনি মানুষকে নষ্ট হতে দেন না।

অতঃপর মহিলাদের জন্যও একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন ছুতো দেখিয়ে সময়মত নামায পড়ার বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখা যায়। অনেক সময় মহিলারা অজুহাত দাঁড় করায়। কিন্তু আমি অনেককে এরূপ দেখেছি যারা পুরুষের তুলনায় নামাযে অধিক সচেতন এবং নামাযের প্রতি বেশি মনোযোগী। হযরত মায়ী কাকো সাহেবা (রা.)

বর্ণনা করেন, একবার আমরা কয়েকজন মহিলা সিকওয়া থেকে হুযূরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসি। মৌলভী কমর উদ্দীন সাহেবের মা আমাকে বলেন, আমাদের প্রত্যেকদিন কাজের ব্যস্ততার কারণে মাগরিবের নামায ইশার নামাযের সাথে জমা করে পড়তে হয়; কি করব? (আমি বললাম) হযরত সাহেবের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করে নাও। আমি হুযূরের নিকট নিবেদন করলাম শিশুদের কারণে মহিলাদের মাগরিবের নামাযে দেরী হয়ে যায়। কি করব? (হুযূর বললেন) আমি বুঝি না যদি কেউ আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করে তাহলে কেন হবে? যদি অপারগতা থাকে তাহলে মাগরিবের সাথে ইশার নামায জমা করে পড়া উচিত। কেননা যেভাবে ফজরের সময় ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয় অনুরূপভাবে মাগরিবের সময়ও ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়। যদি মাগরিব ও ইশার নামায জমা করতেই হয় তাহলে মাগরিবের সাথে ইশার নামায জমা করাই উত্তম। মায়ী কাকো সাহেবা বলেন, সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এ ব্যবস্থাই রেখেছি, মাগরিবের নামাযের পূর্বেই সন্তানদের জন্য খাবার প্রস্তুত করে খাইয়ে দেই। এরপর মাগরিবের নামায পড়ার জন্য প্রস্তুতি নেই। অতএব এই ছিল সেসব ব্যক্তিবর্গের আদর্শ। তাঁদের জমা করার প্রতি মনোযোগ ছিল না বরং যথাসময় নামায পড়ার জন্য যে রীতি অবলম্বন করা উচিত তাদের দৃষ্টি সেদিকে ছিল। অতএব মায়েরা যাদের সন্তানদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত তাদের এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'ইসলাম সেই সর্বশক্তিমান ও সকল প্রকার দোষত্রুটি-মুক্ত খোদা উপস্থাপন করেছে, যার কাছে আমরা দোয়া করতে পারি এবং আমাদের বড় বড় আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করতে পারি। এ কারণে সূরা ফাতিহায় তিনি দোয়া শিখিয়েছেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া কর,** اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ **অর্থাৎ হে প্রভু! আমাদেরকে সেসব লোকের পথে পরিচালিত কর যাদেরকে তুমি মহান কল্যাণ ও পুরস্কারে ভূষিত করেছ। এ দোয়া শিখানোর কারণ হল, যেন তোমরা কেবল এ ভেবে সন্তুষ্ট হয়ে বসে না থাক যে, আমরা ঈমান এনেছি। বরং এরূপ কর্ম সম্পাদন কর যাতে করে তোমরাও অনুরূপ পুরস্কার লাভ করতে পার যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্তগণ লাভ করেছেন'**। তিনি (আ.) বলেন, **'যে ব্যক্তি সত্যিকারের প্রেরণা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ধাবিত হয় সে কখনো ধ্বংস হতে পারে না। এটি সুনিশ্চিৎ ও সত্য কথা, যে খাদার হয়ে যায় খোদাও তাঁর হয়ে যান। আর প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি তাকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। বরং তাঁর প্রতি এত অজস্র ধারায় অনুগ্রহ ও কল্যাণরাজি বর্ষণ করেন যে, মানুষ তাঁর পোষাক থেকেও কল্যাণ লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে** اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ **দোয়া শিখিয়েছেন যেন কৃত কর্মের ফলাফল দেখার জন্য মানুষের দৃষ্টি উন্মোচিত হয়'**। পুনরায় বলেন, **'মানুষ যদি কোন কর্ম করে আর এর কোন ফলাফল প্রকাশ না পায় তাহলে তার বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত। দেখা উচিত আমার কর্ম কেমন যে এর কোন ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে না'**।

এরপর ইবাদতের নীতিমালার সারকথা বলতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'ইবাদতের মূল নীতি হচ্ছে, নিজেকে এমনভাবে** (খোদার সামনে) **দাঁড় করানো যেন খোদাকে দেখছে অথবা** (নিদেনপক্ষে এই বিশ্বাস এই বিশ্বাস করা) **খোদা তাকে দেখছেন। প্রত্যেক প্রকার কৌলুষ ও অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র হওয়া চাই। কেবল তাঁরই মাহাত্ম্য ও প্রভুত্বকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। খোদার কাছে অজস্র ধারায় দোয়া মাসুরা ও অন্যান্য দোয়া করা উচিত। আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন, তাঁর ভালবাসায় বিলীন হবার উদ্দেশ্যে অধিকহারে তওবা, ইস্তেগফার করা এবং ও নিজের দুর্বলতার কথা বারংবার স্বীকার করা উচিত। এটিই হচ্ছে, পুরো নামাযের সার**

সংক্ষেপ আর এ সমস্ত বিষয় সূরা ফাতিহায় বর্ণিত হয়েছে। দেখুন! إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এ আপন দুর্বলতার কথা স্বীকার করা হয়েছে, আর সাহায্যের জন্য খোদা তা'লার কাছে আবেদন করা হয়েছে এবং খোদা তা'লার নিকটই সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। আর এরপর নবী ও রসূলদের পথে চলার জন্য দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া হয়েছে এবং পুরস্কারের জন্য আবেদন করা হয়েছে যা নবী রসূলদের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়েছে আর তা তাঁদেরকে অনুসরণ ও তাঁদের পদ্ধতিতে চলার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। অতঃপর খোদা তা'লার নিকট এই দোয়া করা হয়েছে, ঐসব লোকদের পথ থেকে রক্ষা কর যারা তোমার রসূল ও নবীদেরকে অস্বীকার করেছে এবং ঔদ্ধত্য ও দুস্কৃতির পথ বেছে নিয়েছে। আর এই পৃথিবীতেই তাদের উপর ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে অথবা যারা পৃথিবীকেই নিজেদের আসল উদ্দেশ্য মনে করে নিয়েছে এবং সত্য পথকে পরিত্যাগ করে। নামাযের আসল উদ্দেশ্য হল দোয়া আর এই উদ্দেশ্যে দোয়া করা উচিত যেন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় এবং খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর অবাধ্যতার প্রতি যেন এক সহজাত ঘৃণা জন্মে ও আত্মশুদ্ধি লাভ হয় কেননা তা অনেক বড় এক বিপত্তি যা আমলনামাকে কালিমা লিপ্ত করে। দুনিয়ার সব কিছুর উপর যেন খোদা প্রাধান্য পায়, হোক না তা প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ বা সম্মান ও মাহাত্ম্য। ঐসব কিছুর মাঝে খোদা যেন প্রাধান্য পান তিনিই যেন সবচেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত হন। তাঁকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি অন্য কল্প কাহিনীর পিছনে ছুটছে যার উল্লেখ আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, সে অধঃপতিত ও সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। নামায আসলে একটি দোয়া যা শিখানো পদ্ধতিতে চাওয়া হয়ে থাকে, অর্থাৎ কখনও দাঁড়াতে হয়, কখনও ঝুঁকতে হয়, আবার কখনও সিজদা করতে হয়। আর যে মূলকে বুঝে না সে ছিলকাই আঁকড়ে ধরে'।

তিনি (আ.) আবার বলেন, 'কিছু লোক মসজিদেও যায় নামাযও পড়ে এবং ইসলামের অন্যান্য রুকনও পালন করে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লার সাহায্য-সমর্থন তাদের লাভ হয় না এবং তাদের চরিত্র ও অভ্যাসে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও দেখা যায় না, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তাদের ইবাদত কেবল প্রথাগত বিষয়– যাতে কোন বাস্তবতা নেই। কেননা খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলা এক বীজের ন্যায় হয়ে থাকে, যার প্রভাব আত্মা ও সত্তা উভয়ের উপর পরে থাকে। এক ব্যক্তি যে ক্ষেতে পানি দেয় এবং খুবই পরিশ্রম করে তাতে বীজ বপন করে, দু'এক মাস পরে যদি তা অঙ্কুরিত না হয় (অর্থাৎ বীজ না ফোটে) তাহলে মানতে হয় যে, বীজ খারাপ। একই অবস্থা ইবাদতেরও, যদি এক ব্যক্তি খোদা তা'লাকে এক ও অ-দ্বিতীয় মনে করে, নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং খোদার নির্দেশাবলী যথাসাধ্য মেনে চলে, কিন্তু খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট সাহায্য সে লাভ না করে তাহলে মানতে হবে যে বীজ সে বপন করছে তা ভাল নয়। একই নামায পড়ে অনেক মানুষ কুতুব ও আবদাল হয়ে গেছে। তোমাদের কি হয়েছে যে তা পড়া সত্ত্বেও কোন ফলাফল প্রকাশ পায় না? এটি রীতির কথা, কোন ঔষধ ব্যবহারে তুমি যদি এর কোন উপকারিতা অনুভব না কর তাহলে অবশেষে মানতে হবে যে এই ঔষধ উপযোগী নয়, সেসব নামাযের অবস্থাও এমনিই বুঝা উচিত ।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন এই বাণী বুঝতে পারি এবং সে মোতাবেক নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রকৃত অর্থে ইবাদত করার তৌফিক দান করুন এবং স্বীয় সন্তুষ্টির উত্তরাধিকারী করুন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)